ATHENA, VOLUME VI, JULY 2022 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 160-165
www.athenajournalcbm.in

পরশপাথর : অন্তহীন অন্বেষণ ও প্রাপ্তিহীন নৈরাশ্য

পিয়ালী ভট্টাচার্য*

প্রাপ্ত: ২৭/০২/২০২২ পরিমার্জন: ২২/০৫/২০২২ গৃহীত: ২৪/০৬/২০২২

সারসংক্ষেপ: *সাংসারিক মানুষ দৈনন্দিন অভ্যাসের আবর্তে পিষ্ঠ হলেও তাকেই জীবনের স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। সুখ-দুঃখ- হতাশায় কালাতিপাত করলেও ফেরার কোন চেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায় না। আর সন্ন্যাসী যিনি সমস্ত কিছু ত্যাগ করবেন বলে মহাজাগতিক ছন্দকে চিনে নিতে চেয়েছেন তিনিও যদি অভ্যাসের আবর্তে জীবন থেকে মুখ ফেরানোর চেষ্টা করেন তিনিও হারিয়ে ফেলবেন অনন্তের স্পর্শ। পরশপাথর কবিতায় ক্ষ্যাপা পরশপাথরের অন্বেষণে জীবনের ঐশ্বর্যের প্রতি মুখ ফিরিয়ে অন্তহীন পথে ছুটে চলেছে। সে গৃহহীন, উদাসীন। সমস্ত পার্থিব সম্পদ তার কাছে তুচ্ছ। সে চায় কেবলমাত্র পরশপাথর। তবেই সমস্ত সম্পদ তার হস্তগত হবে। অনন্ত সাধনার সাধ্য তার নেই। তবু তার ব্রত অনন্ত কালের – এটাই তার অভ্যাস। চির বাঞ্ছিতধন তার জীবনে ধরা দিলেও তার অধরা থেকে যায়। তারপরও তার চৈতন্য ফেরেনা। অভ্যাসের চাকায় দীন-হীনের মতো ঘুরতে থাকে। পরিণামে কেবলই নৈরাশ্যের হাতছানি। প্রকৃতির পরিবর্তনে মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয়। কিন্তু যে মানুষ প্রকৃতির দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখে সে ডাক পায়না অনন্তের। পূর্ণতাই পূর্ণতার আকর্ষণে কাছে আসে। ক্ষ্যাপা শূন্যতা দিয়ে শূন্যকে আকর্ষণ করেছে। নিজের ব্রতে অনড় থেকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া পায়নি সে। একমাত্র পরশপাথরের আকাঙ্ক্ষায় হাহাকারকেই সে বরণ করেছে। পরশপাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হলেও অধরা থেকে গেছে সেই প্রাপ্তির আনন্দ।*

সূচক শব্দ: *অভ্যাস, সম্পদ, সাধনা, প্রকৃতি, সমুদ্র, ক্লান্তি, নৈরাশ্য, সঙ্কল্প।*

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: bhattacharyapiyalicbm@gmail.com

মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। প্রাকৃতিক চাহিদার ঘূর্ণাবর্তে মানুষ তার সেই স্বরূপকে হারায়। প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে করতে মানুষ জানতেই পারে না কি অমূল্য সম্পদ ধারণ করে আছে সে। এই অজ্ঞতাই তাকে ছুটিয়ে বেড়ায় প্রতিনিয়ত। ফলস্বরূপ আসে অসন্তোষ। প্রতিবাদ আর বিদ্রোহের আগুনে নিজেকেই নিজে নিঃস্ব করে তোলে। আবার কেউ কেউ অমৃতের খোঁজে যে নিরন্তর সাধনা করে তার মধ্যেও যে বন্ধন আছে সে কথা টের পায় না। চোখের সামনে প্রাপ্তির নানা বৈচিত্র্য থাকলেও মায়াজাল বলে উপেক্ষা করে। এই নিঃস্বতা মানুষকে আরো বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়। কলুর বলদের মত আকাঙ্ক্ষার ঘানি টানতে টানতে রিক্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও প্রেমের কবি। সৌন্দর্যকে স্বীকার করে ও প্রেমকে অবলম্বন করে তিনি আসলে মায়ার ওপারে পৌঁছে যেতে চাইছেন। তাঁর রচিত 'পরশপাথর' কবিতায় তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ছিন্নপত্রে (পত্রসংখ্যা ১৩৫-১৩৬) কবি বলেছেন— "আমি অনেক সময় ভাবি যে, আমাদের বড়ো বড়ো ইচ্ছেগুলো সফল হয় না বলে আমরা দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে অতৃপ্ত থেকে যায় বলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমশ শীর্ণ শুষ্ক হয়ে আসতে থাকে—আমরা সেটাকে সবসময় গণ্য করি নে, কিন্তু পরিমাণে সে জিনিসটি সামান্য নয়।"[১] 'কথা' কাব্যের স্পর্শমণি কবিতায় কবি বলেছেন—

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি,
ছুঁইল যেমনি।[২]

১২৯৯ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ 'পরশপাথর' কবিতা লেখা হয়। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতা। এই কবিতার অন্যতম চরিত্র খ্যাপা। ভূমার সন্ধানে বেরিয়েছে সে। জীবনের আনন্দের সমগ্রতা স্বরূপ পরশপাথর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা এমন কিছু চায় যা চরম সম্পদ। যা সবকিছুকে সোনা করে। খণ্ড খণ্ড সুখে তার তৃপ্তি নাই। বণিক চায় ধন। রাজা চায় রাজ্য, মানী চায় মন, আর খ্যাপা চায় চিরন্তন সেই ধেয় বস্তু। অর্থ-সম্পদের লোভ ভিন্ন অন্য কিছু চাওয়া যে বিষয়ী মানুষের কাছে পাগলামির নামান্তর একথা যেকোনো সংসারী জানেন। তাইতো কবি এই কবিতায় তেমন মানুষকেই খ্যাপা বলে অভিহিত করেছেন। ছয়টি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতায় খ্যাপা সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে গেছে। এইজীবনেই সিদ্ধি এসেছে কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের লক্ষ্যে স্থির। সুদূরের পিয়াসী মন পরশপাথরে নিবদ্ধ। কবিতার প্রথমাংশের প্রথম পংক্তি—

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।[৩]

এই খ্যাপা বায়ুগ্রস্থ পাগল নয়, অসম্ভবের আশায় তার মাথায় কাদা ধুলোর ধূসর জটাজাল। কলেবর ধূলি-ধূসরিত ক্ষীণ। দুই চোখ যেন তীব্র জ্বালাময়। সংসারকে ডেকে বলে এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই। সোনা-রূপা-রাজ সম্পদ সবকিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ। দীনহীন পথের ভিখারির মত সমস্ত বিসর্জন দিয়ে সে শুধু চায় পরশপাথর। এই খ্যাপা সন্ন্যাসী আসলে কি সন্ন্যাসী! তার কি চাওয়ার আছে? এই চাওয়ার অভ্যাসে সে হয়তো বিষয়কে ছাড়িয়েছে। কিন্তু সেকি আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়তে পেরেছে? দৈহিক সুখ না মানসিক স্বাস্থ্য কোন কিছুই তাকে আকর্ষণ করে না। কবি বলছেন –

দুটো চোখ সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন

উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।[৪] 'নিজের আলোকে' বলার অর্থ নিজের সংস্কারের আলোকে। চালচুলোহীন এই খ্যাপা ছাই ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর কটিতে আছে শুধু ধূসর কৌপীন। পথের ভিখারির চেয়েও আরও দীনহীন কাতর নয়নে শূন্যে চেয়ে থাকে যেন। কিসের আকর্ষণে ছুটে বেড়ায় খ্যাপা? রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র এ দেখেছি কবি বলেছেন যে কতগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন খণ্ড বিখণ্ড দস্তুর বাধা কাজের মধ্যে যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনই তাকে সুষ্ঠু অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগ নিয়ে গভীর ভাললাগার তৃপ্তিতে ডুবে যায় তখন তাকে বলি পাগলামি।

খ্যাপার এ পাগলামি?

দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলেছেন— সাগরের মহাগাথা প্রতিনিয়ত বেজেই চলেছে। তার কোন শ্রোতা নেই, সে নিজেই গায়, নিজেই শোনে। গানের ইঙ্গিত অন্য কেউ বোঝেনা। অবিরত অবিরল এই কলকল শব্দে যেন অচল রহস্যকে বলবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে সকলকে। তবু সাগর তো পথ ভ্রষ্ট হয় না। তার ব্যাকুলতা নিয়ে নিজেই নিজের মধ্যে স্বরালাপ করে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, আনন্দে- বিষাদে যাওয়া-আসা চলতেই থাকে। আর যে মানুষ সচেতন, সে মানুষ প্রকৃতির লীলাখেলা অনুধাবন করে প্রকৃতির মুখোমুখি বসে জীবনের সত্য অনুধাবন করে। ছিন্নপত্রে কবি বলছেন - জগত সংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ -অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ - আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। কিন্তু খ্যাপা পরশ পাথরের সন্ধানে একাকী ছুটে চলে। এও যেন ওই খিজিবিজি মানুষের মতই নেতিবাচকতাকেই অবলম্বন করে। সমুদ্রের উত্থান-পতন তাঁর জীবনে কোনও রেখাপাত করেনা -

কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।[৫]

কবিতার তৃতীয় স্তবকে কবি পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। সৃষ্টির ঊষালগ্নে আকাশে যখন প্রথম আলো প্রকাশ পেল তখন সুরাসুর কৌতূহলে এই সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্তব্ধভাবে নিরবে নিমীলিত নেত্রে সমুদ্রের মহাগীতি শুনে পেয়েছিল অতল রহস্য সন্ধান। সমুদ্রমন্থনে পেয়েছিল লক্ষ্মীদেবীর কৃপা। অথচ সন্ন্যাসী সেই সমুদ্রের তীরে পরশপাথর পাওয়ার আশায় ছুটে চলেছে। নিরাসক্ত উদাসীন হৃদয়ের একটি মাত্র চাওয়া - পরশপাথর।

চতুর্থ স্তবকে স্পর্শমণি লাভের কারণ হিসেবে কবি খুঁজে পেয়েছেন নৈরাশ্য ও অভ্যাসের সংস্কার। আসলে আবেগ বেশিদিন তার মোহকে ধরে রাখতে পারেনা। অভ্যাস ও সংস্কারের বশে মানুষ চক্রাকার ঘূর্ণাবর্তে ক্লান্তিহীন শ্রম দিতে থাকে। এটাই তো সংসারের নিয়ম। খ্যাপা প্রকৃতির পরিবর্তনে নিজের অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারেনি। এক লক্ষ্যে দিনের পর দিন নিজের ব্রতে সে অনড়। কবি এই প্রসঙ্গে বিহগ -বিহগীর গীত ও পারস্পরিক আলাপনের প্রসঙ্গ এনেছেন। তারা গাছের শাখায় সারাদিন সারা রাত্রি যেন কাকে দেখে দেখে সারা হয়। কেউ কোথাও আসেনা। তাই নিরাশ হয়। নিরন্তর এই ডাকের বিরাম নেই। এই ডাক আসলে অভ্যাস। প্রকৃতির জড়ত্বের প্রতি গভীর দৃষ্টি পড়েছে কবির। আকাশে বিশাল তরঙ্গ বাহু তুলে সমুদ্র অবিরত তাকে ডেকে চলেছে। যে যাকে ডাকে তাকে সে পায় না। তবু ডেকে চলে শূন্যে বাহু তুলে। যেন আর কোন কর্ম নেই, কোন ব্রত নেই, একমাত্র এক লক্ষ্য। বিধির এমনই বিধান শূন্যতায় রিক্ততায় পূর্ণতা ধরা দেয়না। শূন্যতা শূন্যতার আকর্ষণে সাড়া দেয়। কবি তাইতো বলেছেন -

"যত করে হায় হায় কোনো কালে নাহি পায়,
তবু শূন্যে তোলে বাহু - ওই তার ব্রত।"[৬]

পঞ্চম স্তবকে লোহার শিকলের সোনার পরিণতি দেখানো হয়েছে। সংসার উদাসীন খ্যাপা যখন দুহাত তুলে তপস্যা করছে ও নৈরাশ্যে হাহাকারের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে তখন এক গ্রাম্যবালক সন্ন্যাসীকে বলে—

"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কী, কাঁকালে ওকি ও দেখি?
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"[৭]

বালকের কথায় সন্ন্যাসী চমকিয়ে গেল। সে জানতেও পারেনি লোহার শিকল সোনায় পরিণত হয়েছে। তবে একি স্বপ্ন ঘোর! বিষম বিষাদে কপালে করাঘাত করে বসে পরলো সন্ন্যাসী। শুধুই অভ্যাসমতো দিনের পর দিন ছুঁতে চেয়েছিল

চিরবাঞ্ছিত ধনকে। কিন্তু দৈব ধন খ্যাপার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেল। পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা কখন সোনা হয়ে গেছে লক্ষ্যই করেনি সে। সামান্য নুড়ির মতই পরশপাথর শিকলে ঠেকিয়ে নির্বিচারে ফেলে দিয়েছে। 'কথা' কাব্যে স্পর্শমণি কবিতায় আছে—

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি,
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে, এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।"[৮]

ভক্তমাল গ্রন্থে সনাতন গোস্বামীর আখ্যানে আছে স্পর্শমণির কথা। গোস্বামী যমুনা তটে মণি পেয়ে বালির মধ্যে যমুনায় নিক্ষিপ্ত করে। মানকর এর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিবের স্বপ্নাদেশে তার নিকট উপস্থিত হলে ওই মণি তিনি তাকে দান করেছিলেন। মণি হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ ভাবলেন গোস্বামী এমন রত্ন বালির স্তুপে রেখেছিলেন! তাই তিনি তা ফেরত দিতে চাইলেন। কিন্তু গোস্বামী তা স্পর্শ করলেন না, এমনকি ঘৃণায় সেই দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। যে রত্ন হাতে পেয়ে তিনি এই অমূল্য রত্নকে হেয় জ্ঞান করলেন, ঈশ্বর সেবায় সেই রত্নেরই অধিকারী হবেন? এই ভেবে ব্রাহ্মণ গোস্বামীকে নিবেদন করলেন এবং ভগবত প্রেমলাভের প্রার্থনা করে তার কথাতেই স্পর্শমণি যমুনা গর্ভে নিক্ষেপ করলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে – "প্রেম সাধনাসাধ্য,একেবারে, অর্থাৎ তাদৃশ সাধনা ব্যাতীত সিদ্ধের লভ্য সেই প্রেমের অধিকারী হওয়ার আশা বস্তুতই সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার, অর্থাৎ ইহা অভূতপূর্ব অদৃষ্টচর বিষয় – পাগলের পাগলামি এই প্রেমই স্পর্শমণি, ইহার স্পর্শে মন নিষ্কলুষ হয়, সেই প্রসন্ন মন সর্বত্র ভগবৎ প্রেমের উপলব্ধিতে জগতের সব কিছু সোনার মতোই উত্তম উজ্জ্বল করিয়া তোলে।"[৯]

ষষ্ঠ স্তবকে সোনারাঙা দিনের অবসানের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দিনান্তের লোহিত সূর্য চারিদিকে ছড়িয়ে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করেছে। সমুদ্রপ্রতিফলিত স্বর্ণখনি যেন স্বর্ণদ্রব্যের ভাণ্ড রূপে উপস্থিত। সন্ন্যাসীর একাগ্র মন সোনার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। অথচ খ্যাপা কিছুই জানতে পারছে না। যে মণির স্পর্শ সন্ন্যাসী পেয়েছিল, মুহূর্তমাত্র সেই হারানো মণি আবার নতুন করে খুঁজে দেখতে সে আগের পথেই ফিরে গেল। কিন্তু আজ আর শক্তি নেই। দেহ শিথিল ও নিস্তেজ। দূরের পথ আজ গত হয়েছে, নির্জীব এর মত পড়ে আছে দূরে। দিগন্ত প্রসারিত বালুকাময় বেলাভূমি মরুর মতোই শূন্য বুকে হু হু করছে। সর্বত্রই যেন বিষাদ ও নৈরাশ্যের চিত্র। সারাদিনের কর্ম ক্লান্তির পর রজনী আসন্ন। প্রকৃতির মুখচ্ছবিও ম্লান হয়ে আসলো। আসলে সন্ন্যাসীর বিষাদগ্রস্থ মন সর্বত্র প্রসারিত হয়ে বিষাদের মানচিত্র অংকন করেছে যেন। তাই সন্ন্যাসী যে মণির অন্বেষণে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে বাকি অর্ধ ভগ্নপ্রাণ আবার নিষ্প্রাণ সাধনায় মগ্ন হতে চাইছে। এটাই অজ্ঞতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে - "পরশপাথর এ কবি আদর্শ সন্ধানকে ব্যঙ্গ করেন নাই, করিয়াছেন খ্যাপার দীর্ঘ অন্বেষণক্লান্ত, অসাড়, অভ্যাসবদ্ধ মনোভাবকে। আদর্শ রত্ন সন্ধানের সঙ্গে অন্যমনস্কতার বিসদৃশ সংযোগই তাঁহার অনুযোগের বিষয়।"[১০] অতি সামান্যের মধ্যেও অসামান্যকে অনুভব করতে পারলে জীবন হয়ে ওঠে সোনা। তাই চরম লক্ষ্যের দিকে স্থির থেকে চলার পথে ছোট ছোট সুযোগগুলো অনুভব করতে হয়, আর নয় তো এমনই হারিয়ে যায়। লিপিকায় 'পরীর পরিচয়' প্রবন্ধে আমরা দেখব এমনি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা। "পরী চলে গিয়ে আপন পরিচয় দিয়ে যায়। কিন্তু তখন তাকে আর পাওয়া যায় না।" যেমন পরশপাথর সোনা করে দিয়ে চলে গেছে খ্যাপার অজান্তে।

রবীন্দ্রদর্শন বৈষ্ণবের দর্শনের মতো দ্বৈততায় গড়ে উঠেছে। মায়া - মোহ বলে জগতকে উড়িয়ে দিয়ে অদ্বৈত ভাবনায় আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা নয়, জীবনের রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের খোঁজ করে যাওয়াই ধর্ম বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আত্মপরিচয় প্রবন্ধে বলেছেন- "প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধি ও মন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে –সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করিনা, সেই মোহকে আমি নিন্দা করিনা। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তিই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।"[১১] অথচ

এই কবিতায় সন্ন্যাসী প্রকৃতির দানকে স্বেচ্ছায় অবহেলা করেছে। অন্তরে হাহকার থাকলে পূর্ণতর সত্যকে অনুভব করা যায় না। কবি এই প্রকৃতির সমগ্রতায় সত্যকে অনুভব করেছেন তাই সহস্র বন্ধনের মাঝে মুক্ত হতে পারেন। সন্ন্যাসী বদ্ধ হওয়ার ভয়ে নিজেকে অভুক্ত রাখেন। শরীর মন ক্লান্ত হলে ধরার মাঝে অধরা চকিত চমকে ফিরে যায়। তাই তো কবি মুক্তিরসের আস্বাদন করতে বলেন। 'জীবন স্মৃতি'তে তিনি বলেছেন – "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।"[১২] নৈবেদ্য কাব্যের মুক্তি কবিতায় সেই কথাই ধ্বনিত—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।....."[১৩]

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন – "এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।"[১৪] অর্থাৎ সংসারবিরাগী হয়ে শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান হয় না। চলমান এই জগতের প্রতিটা সৃষ্টির বৈভব অন্তরে ধারণ করে নিজেকে পূর্ণ করে নিতে হয়। তবেই অভীষ্ট বস্তু গ্রহণের ক্ষমতা জন্মে। আলোচ্য কবিতায় খ্যাপার যাত্রাটাই ছিল ভুলের প্রতি। রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলেও অন্তরের লোভ ছিল। আর এই লোভই তাকে বিষাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পরশপাথর চাওয়ার অর্থও তো এক চাওয়া। সন্ন্যাসীর আবার চাওয়া কি! আধ্যাত্মিকতা মানুষকে হয়ে উঠতে সাহায্য করে, কিছু পাইয়ে দেয়না। অথচ আমরা হয়ে ওঠার চেষ্টা না করে হস্তগত করতে চাই। এই প্রবৃত্তি তো আসুরিক। যদিও খ্যাপার মধ্যে কোথাও আসুরিক সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর চাওয়া যে সেই সংকেত দেয়। সংসার জীবনে আমাদের মধ্যেও এই ভাব তো আছেই। হয়ে ওঠার চেষ্টার চেয়ে হাতে পাওয়ার সুতীব্র আগ্রহ আমাদের নিঃশেষ করে, ক্লান্ত করে, বিষাদগ্রস্থ করে। খ্যাপা এতো সাধ্য সাধনা করে আনন্দের পরিবর্তে বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছে। আসলে আনন্দ পেতে গেলে নিবিড় আত্মমগ্নতা প্রয়োজন, অভ্যাসের ঘূর্ণিপাকে মগ্নতা থাকেনা, থাকে মোহ। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধে বলেন– "বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি যা দেয়না চেতনার, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে, বিপদে, বিদ্রোহে, বিপ্লবে, অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়। একদিন এই কথাটি আমার কোন এক কবিতায় লিখেছিলাম; বলেছিলাম, আমার অন্তরের আমি আলস্যে, আবেশে, বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই আসল আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।"[১৫]

সূত্র নির্দেশ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৪০৯ ব.), *ছিন্নপত্রাবলী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ২০৭।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড),* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৫১।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *সঞ্চয়িতা,* সোনার তরী, পরশপাথর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১২০।

৪. *তদেব,* পৃ. ১২১।

৫. *তদেব।*

৬. *তদেব,* পৃ. ১২২।

৭. *তদেব।*

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫২।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, (মাঘ ১৪০৬ ব.) *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, কবির কথা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১৮৭।

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, (২৫ বৈশাখ, ১৩৭৩ ব.), *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা,* ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, পৃ. ৬৪।

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, আত্মপরিচয়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১৪৬।

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড,* জীবন স্মৃতি, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৫০০।

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *সঞ্চয়িতা,* নৈবেদ্য, মুক্তি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৪৩৭।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫০১।

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (পৌষ ১৪১৭ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড,* সাহিত্য তত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, পৃ. ৪৭৭।